জঙ্গলের খাওয়া-দাওয়া

বুদ্ধদেব গুহ

জঙ্গলের খাওয়া-দাওয়ার কথা বলতে গেলে প্রথমেই খিচুড়ির কথা বলতে হয়। আমরা যেসব জঙ্গলে থাকতাম তার ধারেকাছে গ্রাম থাকলেও হাট বা সাপ্তাহিক বাজার বলতে গ্রামাঞ্চলের জনপদের কাছে (আমরা জনপদ বলতে যা বুঝি তেমন বড় জনপদ তো জঙ্গলের মধ্যে থাকে না) জঙ্গলে পৌঁছবার সময় চাল-ডাল মশলাপাতি, পথের হাটে কেনা পাঁঠা বা শুয়োরের মাংস, মুরগি, ডিম এবং কোথাও কোথাও মাছও কিনে নেওয়া হত। কিন্তু তা ফুরিয়ে যেত অচিরেই। তখন আলু-পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা দেওয়া খিচুড়ি, সঙ্গে ঘি এবং শুকনো লঙ্কা ভাজা। এ-বেলা খিচুড়ি ও-বেলা খিচুড়ি। নিরামিষ। তবে জঙ্গলে Pot Hunting তো হতোই। জঙ্গল ভেদে বনমুরগি, তিতির, কালি তিতির, হরিয়াল, বটের, খরগোস, বনশুয়োর, শজারু, ছোট জাতের হরিণ এসব কেউ না কেউ শিকার করে আনতেনই আর তা দিয়েই আমিষের পদ হত। বসন্তশেষে জংলী কাঁঠালের গাছ থেকে এঁচড় পেড়ে খাওয়া হত। ওড়িশাতে কাঁঠালকে বলে ‘পনস’। ওড়িশার জঙ্গলে আমরা ছোট হরিণ বা খরগোস মারতে পারলে, ছোট শুয়োরের মাংসেও ভাল হয়, নলা-পোড়া খেতাম। যেখানে মোটা বাঁশ পাওয়া যায়, (যেমন ওড়িশাতে, উত্তরবঙ্গে আসামে এবং পূর্বাঞ্চলের নানা জঙ্গলে) যেখানে বাঁশের একটি টুকরো কেটে নিয়ে একদিকের গাঁটে ফুটো করে তার মধ্যে ডুমো ডুমো করে মাংস কেটে গরম মশলা ইত্যাদি এবং তেল-ঘি দিয়ে মেখে (যে মশলা মাংস রান্নাতে দেওয়া হয়) ক্যাম্পফায়ারের মধ্যে ফেলে দিতে হয় সেই ফুটোটি কাদা বা ময়দা বা আঠা দিয়ে বন্ধ করে। তারপর বার-বী-কিউ করার সময়ে যেমন মাংস মাঝে মাঝে ঘোরাতে হয় সবদিকে সমান আঁচ পাওয়ার জন্যে, তেমন করে

ঘোরাতে হয়। বাঁশের টুকরোটি একসময় ফট শব্দ করে ফেটে যায়। তখন মধ্যের মাংস বের করে নুন দিয়ে খেতে হয়। সঙ্গে কোনও স্যালাডও থাকতে পারে। নুন কিন্তু আগে দিতে হয় না। দিলে কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারণে সব পন্ড হবে। বাঁশের ভিতর থেকে যে রসটি বেরোয় তাই মাংসকে স্বাদু ও সিদ্ধ করে। নুন দিলে অখাদ্য হয়ে যায়।

আমাদের জঙ্গলের বন্ধু বিমলবাবু, অঙ্গুলের বিমল ঘোষ মশাই খুব ভাল স্যালাড বানাতেন। সেই স্যালাডে যা যা সচরাচর স্যালাডে দেওয়া হয় তার সবই দিতেন উনি। শশা, বিট, গাজর, কাঁচালঙ্কা, টোম্যাটো (লেটুস জঙ্গলে পাওয়া যেত না) ইত্যাদি। তারপর সেই স্যালাড একটি বড় পাত্রে রেখে সর্ষের তেল দিয়ে মাখতেন (স্যালাড অয়েলের অবর্তমানে) তারপর তাতে একটু নুন এবং একটু চিনি দিয়ে রোদে দিয়ে রাখতেন তিন-চার ঘন্টা। খাবার সময়ে সার্ভ করলে উপাদেয় লাগতো খেতে। তবে স্যালাড অয়েল দিলেও ওরকম স্বাদ হবে কি না বলতে পারব না, আপনারা দিয়ে দেখতে পারেন সর্ষের তেলের বদলে।

শুয়োরের মাংসর ভিন্ডালু রাঁধত অতি চমৎকার ঝাড়খন্ডের ম্যাকলাস্কিগঞ্জের আমার জঙ্গলময় বন-বাংলোর কেয়ার-টেকার প্যাট গ্লাসকিন। যাঁরা 'একটু উষ্ণতার জন্যে' উপন্যাসটি পড়েছেন তাঁরা ওঁর নাম জানবেন। পর্ক চপ ভাল বানাত আমার মালীর স্ত্রী মুঙ্গরী। সাহেবদের কাছে কাজ করেছিল বহু বছর তাই নানা বিলেতি রান্না শিখেছিল।

মণিপুর আর বার্মার (এখন মিয়ানমার) সীমান্তের জঙ্গলের মধ্যে শেষ ভারতীয় গ্রাম 'মোরে'তে এক পরিচিত মণিপুরি ভদ্রলোকের বাড়িতে, যাঁর স্ত্রী ছিলেন বর্মী, 'খাউ সুয়ে' খেয়েছিলাম। প্রচন্ড ঝাল। কিন্তু আমি ঝালের ভক্ত তাই খুবই ভাল লেগেছিল।

শিলচর এবং আগরতলার জঙ্গলে পরিচিতদের নিজে হাতে রান্না করা শুঁটকি মাছ খেয়েছি নানারকম। লইট্টা, চিংড়ি, ইলিশ, শিঁদল ইত্যাদি। শুঁটকি মাছ আমার খুবই প্রিয় খাদ্য। কোথাও পেলে আহ্লাদে আটখানা হই। বাড়িতে আমার স্ত্রী ঢুকতে দেন না।

জঙ্গলে খাওয়া-দাওয়ার সুখ ছিল বিহারের (এখন ঝাড়খন্ডের) পালাম্যুতে। আসলে জঙ্গলের খাওয়া-দাওয়া Host-এর Resourcefulness-এর উপরে নির্ভর করে। মোহন বিশ্বাস, প্রিন্স অফ পালাম্যু ছিল আমার অনুজের মতো এবং আমাদের মক্কেলও। কোনও বাংলোয় কোনবার থাকব তা আগেই তার কলকাতার ম্যানেজার গৌরকে বলে দিতাম। সেই মতো কেচকী বা কেঁড় বা মারুমার বা গাড়ু বা রুমান্ডি বা মুন্ডু বা রুদ-এর মতো বাংলো বুক করে দিত মোহন। ট্রেনে বা প্লেনে গিয়ে এস ই আর হোটেলে চান করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে একশো বা ততোধিক মাইলের ড্রাইভের শেষে গিয়ে পৌঁছতাম নির্ধারিত বাংলোতে। জুম্মান ছিল ওঁরাও।

আদিবাসী। বব রাইট, অ্যানন রাইট, জ্যোতিবাবুর একমাত্র ভায়রাভাই আমার টেনিস খেলার বন্ধু জয়ন্ত রায় ও তার পরমা সুন্দরী স্ত্রী মঞ্জুলারা গেলেও জুম্মানই রান্না করত। দুপুরে রাঁধত পোলাও, পাঁঠার মাংস, অড়হরের ডাল, একটা সবজি, বছরের সময় ভেদে পুদিনা বা ধনেপাতা বা টোমাটোর চাটনি, লাতেহার বা ডালটনগঞ্জ থেকে আনানো কালা জামুন অথবা কালাকাঁদ। বিকেলে মাংসর কাবাবের সঙ্গে চা। রাতে ইংরেজি রান্না, স্যুপ, চিকেন বা পাঁঠার রোস্ট, স্যালাড, দারুণ ডেসার্ট -- এক এক রাতে একেক রকম। শীতকাল হলে বাংলোর হাতাতে বার-বী-কিউ করা হত আস্ত সাকলিং পিগ বা ছোট পাঁঠার। ঘি ঢালতে ঢালতে সেটিকে চক্রাকারে ঘোরাতো জুম্মান অথবা তার কোনও সাগরেদ। বাইরে ক্যাম্পফায়ার না করা হলে বাংলোর ভিতরের ফায়ারপ্লেসের সামনে সবাই গোল হয়ে বসে শিকারের এবং অন্য গল্প করা হতো।

কোনও কোনওদিন জুম্মান লিট্টি বানাত। ছাতুর লিট্টি। তাতে চমচ চামচ গাওয়া ঘি ঢেলে টমাটো, পেঁয়াজ এবং কাঁচালঙ্কার চাটনি দিয়ে খেতে হতো। লিট্টি খেলে পালাম্যুর প্রচন্ড শীতের রাতেও লেপ বা কম্বল গায়ে রাখা যেত না। তবে লিট্টি, শুঁটকি মাছেরই মতো এক ডেলিকেসি -- যাঁরা না খেয়েছেন এবং স্বাদ না রপ্ত করেছেন তাঁরা জানবেনও না তাঁরা কী হারালেন।

'বিরিয়ানি, চাঁব, কাবাব ইত্যাদিও জঙ্গলে জুম্মান রাঁধত চমৎকার। তবে বিরিয়ানির কথাই যখন উঠল তখন হাজারীবাগের মহম্মদ নাজিমের নাম না করলে নিমকহারামি হবে। অমন বিরিয়ানি আর কেউই বুঝি রাঁধতে পারবেন না। দিল্লির ওবেরয়ের মোগলাই রেস্তোরাঁই বলুন, আর কলকাতার রয়াল বা সিরাজ বা জিশান কেউই ধারেকাছে আসে না। সারাদিন জঙ্গলে বন্দুক, রাইফেল কাঁধে পাঁচ-সাত মাইল হেঁটে কুকুরের মতো ক্লান্ত হয়ে যখন জঙ্গলের ডেরাতে ফিরতাম তখন দূর থেকে সেই বিরিয়ানির গন্ধ পেতাম। আর শুধুই বিরিয়ানি ? সঙ্গে চাঁব, পায়া, চৌরি, লাব্বা, কবুরা, মগজ আরও কত কী। বহৎ পরিমান পাঁঠার মগজ যৌবনে খেয়েছি বলেই বোধহয় নিজের মগজটিও পাঁঠার মগজের মতো হয়ে গেল।

হাজারীবাগ থেকে একবার চাতরায় শিকারে গেছিলাম দল বেঁধে। সকালবেলা জিলিপি-সিঙ্গারা খেয়ে সারাটা দিন তিনটি পাহাড়ে হাঁটা আর শিকার হল শুধুমাত্র একটি মস্ত সজারু। ওরা বলে 'সাহিল'। সূর্য যখন ডুবছে আমরা ডাকবাংলোর কাছে পৌঁছেছি এসে। সফর আলি, নাজিমসাহেবের দোস্ত, বিরিয়ানি বসিয়েছেন বিরাট হাঁড়িতে আর তার খুশবু উড়ছে শীত-সন্ধ্যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে খাওয়া সেই বিরিয়ানির স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে।

একবার নাজিম সাহেবের সঙ্গে আমি আর আমার বন্ধু গোপাল, দুজনেই তখন ছাত্র, বাসে করে চাতরা হয়ে পাহাড়ের উপরে গয়া জেলার এক অখ্যাত গ্রাম জৌরীতে গিয়ে থামলাম -- হালকা চাঁদের আলোতে প্রচন্ড শীতের এক রাতে। পথের পাশেই ছোট্ট একটি মসজিদ। সেই মসজিদের মৌলবির বাড়িতে রাতের খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। একটি তক্তপোষের উপরে সতরঞ্জি পাতা। তার উপরে ফেজ টুপি পরা সাদা দাড়িওয়ালা

মৌলবি বসে আছেন। সঙ্গে নানা রঙের লুঙি পরিহিত জোব্বা গায়ে মৌলবি সাহেবের দোস্ত-বিরাদরেরা বসে আছেন। আমরা যেতেই গাড়ু থেকে জল নিয়ে উজু করে সেই তক্তপোষে বসে গেলাম। এক পাঁজা বাজরার ইয়া মোটা মোটা রুটি এনে তক্তপোষের উপরে সাজিয়ে রাখা হল আর বিরাট একটা লাল-নীল ফুল তোলা কলাই করা গামলাতে মুরগির ঝোল। মনে হল, কমপক্ষে গোটা ছয়েক মুরগি জবাই হয়েছে। গামলাটা আসা মাত্র সকলেই রুটি তুলে নিয়ে সেই গামলাতে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেতে লাগলেন। ক্ষুধার্ত ছেলেমানুষ আমরাও যোগ দিলাম। খাওয়ার পরে এক কামরার খাপরার চালের মাটির ঘর-এর মাদ্রাসাতে -- যা তখন বন্ধ ছিল -- মেঝেতে খড় পেতে আমরা অর্ধেক রাত শোব তারপর ভোর চারটেতে উঠে গরুর গাড়িতে করে ফল্গুর দুই শাখা নদী জাঁম আর ইলাজান নদী পেরিয়ে রঘু শেঠ-এর ভান্ডারে গিয়ে সস্তা করে দিনভর হাঁকোয়া শিকার করব।

আমার কিন্তু মৌলবি সাহেবের ছোট্ট ঘরের তক্তপোষে -- ওটিই চেয়ার, ওটিই টেবিল -- খাওয়ার ব্যাপারটা খুব ভাল লেগেছিল। ইসলামে যে 'বিরাদরীর' কথা বলা হয় তার প্রকৃত স্বরূপ সেই অল্পবয়সেই জেনেছিলাম। মুসলমানদের মধ্যে বামন-কায়েত-নমশূদ্র নেই -- সকলেই সমান -- সেইখানেই ইসলামের জোরের উৎস।

ভারতের সবচেয়ে বড় অভ্র রপ্তানিকারক ছিল কোডারমার কাছে ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানি। সাহেবদের ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরই তাঁরা উত্তরপ্রদেশীয় রামকুমার আগরওয়ালাকে বিক্রি করে দিয়ে চলে যান। চতুর্দিকে গভীর জঙ্গল। কাছেই রজৌলির ঘাট। সুগভীর জঙ্গলময় ঘাট পেরিয়ে নওয়াদা পাওয়াপুরি বিহার শরিফ ইত্যাদি জায়গাতে যেতে হতো। ওঁরা আমাদের মক্কেল ছিলেন বলে ওখানে প্রায়ই শিকারে যেতাম। থাকতাম ওঁদের গেস্ট হাউসে -- পাঁচ নম্বর বাংলোতে। তখনও সাহেবী ঠাঁট-বাট পুরো ছিল। একজন বি এ পাশ বাঙালি ইংরেজি-জানা ভদ্রলোক স্টুয়ার্ড ছিলেন। নানারকম অতিথি সমাগম হত, তাই একজন লাল রঙা ফেজ টুপি পরা মুসলমান বাবুর্চি আর একজন টিকিওয়ালা পন্ডিত হিন্দু রাঁধুনি। পাঁচ নম্বর বাংলোটার চারপাশেই জঙ্গল -- কোনও কম্পাউন্ড ওয়াল বা তারের বেড়া-টেড়াও ছিল না। তবে গেট একটা ছিল লালমাটির

কাঁচা ড্রাইভওয়ের মুখে। তারপর পিচের রাস্তা -- রাস্তা পেরোলেই আবার জঙ্গল। ওই জঙ্গলে আমি কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ে একটি চিতা মেরেছিলাম।

সেখানে খাওয়া-দাওয়ার মোচ্ছব হত। নানা রকম মিষ্টি ও নোনতা। ইংলিশ হান্টলি-পামার কোম্পানির বিস্কিট আর চা দিয়ে বেড টি হতো। তারপর পুরো ইংলিশ ব্রেকফাস্ট -- দুধ-কর্নফ্লেক্স-নানা ফল, এগস-টু-অর্ডার-বিলেত থেকে ইমপোর্ট করা শুয়োরের সালামি, সসেজ ইত্যাদি, কড়কড়ে টোস্ট, তারপর চা অথবা কফি। দুপুরে হয় মোগলাই নয়তো উত্তর ভারতীয় হিন্দু খাদ্য হতো আর রাতে অবশ্যই ইংলিশ খানা। ডেসার্টে কত রকমের যে ডিশ করত রহমৎ বাবুর্চি। সে না কি বিলেতি জাহাজ কোম্পানি পি অ্যান্ড ও লাইনে কাজ করত। সময়ের আগেই রিটায়ার করে ক্রিশ্চান কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিল ওর একমাত্র বিবি মারা যাওয়ার পরে। ওর বাড়ি ছিল নওয়াদায় -- কাছেই -- তাই।

জঙ্গলের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত কাপ্তানিও যেমন করেছি কিছু মক্কেলের দৌলতে আবার কারও কারও দৌলতে প্রচন্ড কৃচ্ছ্বসাধনও করেছি। সব মক্কেলের মন এবং স্বভাব এক নয়। ওড়িশার বামরা করদ রাজ্যে আমাদের এক কাঠের ঠিকাদার মক্কেল দু-বেলা ভাত, মুসুরির ডাল আর আলুভাজা খাইয়েছিলেন সাতদিন। পাতে অবশ্য খাঁটি গাওয়া ঘি দিতেন। এবং খাওয়ার পরে নিজের ডেরার গাছে-ফলা পেঁপে। সেবার, সঙ্গে বাবা এবং তাঁর দুই বন্ধুও ছিলেন। তাঁরই আতিথেয়তার কারণে এক রাতে কনসর নদী পেরিয়ে 'কিলবগা' নামের একটি জায়গাতে মেঠো ইঁদুর ঝলসে পুড়িয়ে খেয়েছিলাম নুন-লঙ্কা দিয়ে। মেঠো ইঁদুরের মাংস কিন্তু খুব নরম ও মিষ্টি। -- গায়ে সুগন্ধী চালের গন্ধ।

বললে, অনেক গল্পই বলা যায় কিন্তু পাঠকদের বোধহয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে।

পুব আফ্রিকার টানজানিয়ার জঙ্গলের মধ্যে সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক-এর পথে গোরোংগোরো ন্যাশনাল পার্ক ও গেম ওয়ার্ডেন-এর মারা ওয়াইল্ড বিস্ট-এর মাংসর স্টেক খেয়েছিলাম ডিনারে। গোরোংগোরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আগ্নেয়গিরি -- কিন্তু বহুদিন হল মৃত এবং তার জাগবার কোনও আশঙ্কা নেই। সেই আগ্নেয়গিরি গহ্বরে -- বহু মাইলের পরিধি তার,

নেই এমন জানোয়ার নেই।

ওয়াইল্ড বিস্ট-এর মাংস একেবারে অখাদ্য। আমাদের দেশের শম্বরেরাও মস্ত মস্ত হয় কিন্তু শম্বরের কষা মাংস বা কাটলেট চমৎকার হয়। ওয়াইল্ড বিস্টরা যেমন কুৎসিত দেখতে তাদের মাংসও তেমনই অখাদ্য।
আন্ডারডান করে সার্ভ করতে বলা সত্ত্বেও যখন সার্ভ করল তখন অনেক চেষ্টা করেও তাকে কায়দা করতে পারলাম না, প্রায় অভুক্তই থাকতে হয়েছিল সেই রাতে।

সমাপ্ত